পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংকলন
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭৭
দাম : ৫০ পয়সা

● বিজ্ঞান কর্মীদের আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি—২ ● বিশ্ব বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার দাবী সনদ—৮
● ইউনেস্কোর সুপারিশ—১৩ ● পুস্তক পরিচিতি—১৪ ● চিঠিপত্র—১৭

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন, বিজ্ঞানকর্মীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে শেষপর্য্যন্ত একটি সুষ্ঠু মতবাদগঠন আমাদের পত্রিকার লক্ষ্য। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান বিকাশের পথে মূল প্রতিবন্ধকগুলো কোথায়, বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে আসল অন্তরায়গুলো কি কি, কেন বাস্তববাদী ও যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রায় সার্বিক অনুপস্থিতি, বিশাল ব্যয়বহুল জমকালো প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের অস্তিত্ব সত্বেও কেন ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপক দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কার, নানা 'বাবা'-বাদী ধ্যানধারণার কবলিত সমাজব্যবস্থা, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নগুলোকে অতীত ও বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার আলোকে আমরা যথাসম্ভব বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চাই।

এক সমস্যাক্রান্ত সামাজিক পরিবেশ আজ আমাদের চারপাশে—বিজ্ঞানজগতও তার ব্যতিক্রম নয়; সামাজিক ব্যাধিগুলোর স্পষ্ট প্রতিফলন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। চরম হতাশা, উদ্দেশ্যহীনতা আজ গ্রাস করেছে বিজ্ঞানকর্মীদের। অবস্থার অবনতি ঘটতে সাহায্য করেছে বিজ্ঞানকর্মী ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরাজমান লজ্জাজনক 'প্রভু ভৃত্য' সম্পর্ক, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অভাব। যোশেফ, বিনোদশাহ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু এই দুঃসহ অবস্থারই করুণ পরিণাম। অতীতের সহস্র অসাফল্য থেকে উদ্ভূত সাম্প্রতিক পরিস্থিতি হয়তো যুক্তির বিচারে, স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য—তবু ভবিষ্যৎ কখনো অপরিবর্তনীয় হতে পারে না, এই আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান পরিস্থিতির মুখোমুখি সাধ্যমত দাঁড়ানো তাই আজ আমাদের কর্তব্য। আর, আমাদের বিশ্বাস ও প্রচেষ্টার ভিত হ'ল আমাদেরই অতীত, আমাদেরই সংগ্রামী ঐতিহ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ সর্বস্তরে ধূমায়িত হয়েছিল তারই অংশীদার হিসেবে বিজ্ঞানকর্মীরা সংগঠিত হয়েছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছিলেন বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে। মানবতার বধ্যভূমি হিরোসিমা-নাগাসাকি বিজ্ঞানকর্মীদের সামনে দীর্ঘদিন এক রক্তাক্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েছিল: "কিসের জন্য, কাদের জন্য বিজ্ঞান?" বিশ্বের বিজ্ঞানকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সামাজিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে সেদিন জন্ম নিয়েছিল 'বিশ্ব বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা'।

ভারতবর্ষ তখনও পরাধীন—প্রায় অবিকশিত আধুনিক বিজ্ঞান, স্বভাবতই তখনও সম্পূর্ণ অসংগঠিত ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীরা, তবু ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানকর্মীদের অনেকেই সেদিন জাতীয় ও সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের সুফলগুলোর সুসম বণ্টন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন, সমাজবিকাশের গতির সাথে বিজ্ঞানবিকাশের সামঞ্জস্য ও সংযুক্তিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলো অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে হ'লেও অন্তত তাঁদের একটি অংশের চেতনার অন্তর্গত ছিল। সম্ভবত তারই ফল হিসেবে উনিশশ সাতচল্লিশ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে "ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মী সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয় সমাজ বিকাশের ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এই প্রতিষ্ঠানের অভিমুখ ও কার্য্যকারিতা বিচার বিবেচনা করে দেখা আজ আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য। স্বদেশের ও বিদেশের বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের

ইতিবৃত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এড়িয়ে ভবিষ্যতের পথনির্ধারণ সম্ভব নয়—সম্ভব নয় পরবর্ত্তী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও রূপরেখানির্ণয় তথা দাবীপত্রনির্মাণ।

অতীতের শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ গঠনের স্বার্থে ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান সংখ্যায় বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি আমরা প্রকাশ করছি। আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটি অনুধাবনের সুবিধার্থে সঙ্গে থাকছে বিশ্ববিজ্ঞানকর্মী সংস্থার দাবীসনদ, জাতিপুঞ্জের শিক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (UNESCO) বিজ্ঞানকর্মীদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ। পুনর্মুদ্রিত দলিলগুলোতে নিহিত দাবীগুলোর অন্তর্বস্তুর সাথে বিজ্ঞানকর্মীবন্ধুরা যে যার প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মিলিয়ে দেখে বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযুক্ত একটি সাধারণ ও তারই ভিত্তিতে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নির্ভর একটি দাবীসনদ নির্মাণে সচেষ্ট হবেন, এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুরোধ।

বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি

বিজ্ঞান কি সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবার্ট বয়েল বলেছিলেন—এ হচ্ছে সেই জ্ঞান "as has a tendency to use"। এই বিজ্ঞানের ব্যবহারের ফল হিসেবেই আমরা আমাদের চার পাশের প্রকৃতিকে বশ করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছি, জীবনধারণের উপকরণগুলি পেয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে এবং পরেও আমরা দেখছি যে বিজ্ঞান এমন এক শ্রেণীর লোকের হাতে মারাত্মক শক্তি অর্পণ করেছে, যারা ঐ শক্তির অপব্যবহারই করে চলেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তাই বলে থেমে থাকছে না। মারণাস্ত্রের সমর সজ্জাও বাড়ছে, আনবিক বোমা, নিউট্রনবোমা, জীবাণুযুদ্ধ আজ মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু "বিজ্ঞান কি নিজস্ব প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? বিজ্ঞান বলতে যদি জ্ঞানকেই না বুঝি, তার কর্মীদেরও যদি এর আওতায় ধরি তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর—নিশ্চয়। চিকিৎসকদের পেশাগত কিছু ethics আছে, তাতে তাঁরা তাঁদের বিদ্যাকে মানুষের নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন না। সব বিজ্ঞানের লোকেদেরও যদি এরকম কোনও ethics থাকত তবে তাঁরা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারতেন; কারণ বিজ্ঞানের লোকেদের বাদ দিয়ে একটি চাকাকেও ঘোরানো যাবে না।"[১] অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের তুলনায় বিজ্ঞানকর্মীদের সামাজিক দায়িত্ব এই হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অর্জন করেছে। আর এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য বিজ্ঞানকর্মীরা দেশে দেশে প্রতিরোধ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। সভ্যতার জন্য ও বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানীদের আত্মত্যাগের নজীর ঐতিহাসিক প্রাচীন, রোজেনবার্গদম্পতি, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, তাকেতানি প্রমুখ বিজ্ঞানকর্মীরা সেই ঐতিহ্যকে আগে বহন করে গেছেন।

বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের ইতিহাস বিচার করলে তার মধ্যে দুটো ধারাকে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলির লক্ষ্য ছিল মূলতঃ বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বের আদানপ্রদান সহজতর করা, বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো। শাসক গোষ্ঠীর হাতে পড়ে বিজ্ঞানের সামাজিক অপব্যবহার বা বিজ্ঞানকর্মীদের উপর অর্থনৈতিক অন্যবিধ অবিচার তখনও কোন সমস্যা হিসাবে গুরুত্ব পায়নি। পরের দিকে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের আর একটি ধারা জন্ম নিয়েছে। এই ধারায় দেখতে পাই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য আন্দোলন সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের আন্দোলনের স্রোতের সাথে চলার চেষ্টা করছে।

এই দ্বিতীয় ধারার প্রথম সূত্রপাত হয় ইংলণ্ডে। সেখানে ১৯১৭ সালে অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স নামে বিজ্ঞানকর্মীদের এক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। "প্রথমে মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের ভিতর থেকেই এর সদস্যরা আসতেন। এদের অনেকে সংগঠনের ট্রেড ইউনিয়ন চরিত্রের ব্যাপারে ভয় পেতেন। ১৯৬২-এর (ব্রিটেনের) বিরাট সাধারণ ধর্মঘটের পরে ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী দমনমূলক আইনের চাপে পড়ে ট্রেড ইউনিয়ন চরিত্র বাদ দিয়ে এই সংগঠনকে অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয়।"[২] ১৯৪০-এ অবশ্য এই সংগঠন আবার ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও বিজ্ঞানকর্মীদের সদৃশ সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। জাপানের বিজ্ঞানকর্মীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ওসাকা ও কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকেতানী, সাকাতা প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গোষ্ঠীর

প্রচেষ্টায় ১৯২৯-এ এংগেলসের ডায়ালেকটিক্স অব নেচারের জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৩] এঁদের গোষ্ঠী সেকাই বুন্কা (বিশ্ব সংস্কৃতি) নামে এক পত্রিকা বের করতেন। জাপানকর্তৃক চীন আক্রমনের সময় এই পত্রিকার সংগে যুক্ত তাকেতানী এবং আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। বিজ্ঞানকর্মীদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট সরকারের অভিযোগগুলির ভিতর ছিল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আলোচনা, মেসনতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব তত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে কমুনিষ্ট সংগঠনের সহায়তা করা ইত্যাদি।[৪] প্রসঙ্গত, হিটলার থিওরী অব্ রিলেটিভিটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল এবং নাজীরা আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে পুড়িয়ে বহ্ন্যুৎসব করেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের পট-ভূমিকা ভিন্নতর ছিল। এখানে জনগণের স্বার্থে বিজ্ঞানকে প্রয়োগের সরকারী চেষ্টার ত্রুটি ছিল না এবং বিজ্ঞানকর্মীদের সুযোগ সুবিধাও ছিল ব্যাপক। বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্যও তাই ছিল সরকারের সংগে সহযোগিতায় জনগণের কাজে বিজ্ঞানকে লাগানো। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিজ্ঞানকর্মীদের কার্যক্রমের ভিতর বৈজ্ঞানিক সচেতনতা ও সামাজিক সচেতনতার এক অদ্ভুত মিলন লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানের সঠিক দর্শনের জন্য, শান্তির জন্য সংগ্রামে এবং জনগণের কল্যাণে রাশিয়ার বিজ্ঞানকর্মীদের অবদান অনেক। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে রাশিয়ার বিজ্ঞানকর্মীরা সৈনিকের মতই লড়াই চালিয়েছিলেন।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইএর ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের ভিতর এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল। যুদ্ধের সময় ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীগণ একই সাথে সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। এই সময়কারই পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের ভিত্তিতে ১৯৪৬এ বিজ্ঞানকর্মীদের বিশ্বসংগঠন World Federation of Scientific Workers গঠিত হয়। এই সংগঠনের বিভিন্ন জাতীয় শাখাগুলির উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। এক, ট্রেড্ ইউনিয়ন হিসাবে এর সদস্যদের অধিকার এবং স্বার্থরক্ষা করা এবং দুই, জাতীয় অর্থনীতিতে ও সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলিতে বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্বসংগঠনের দাবী সনদের ভূমিকায় বলা হয়েছে—"বিজ্ঞানকর্মীরা যদি তাঁদের প্রতিভার পুরো সদ্ব্যবহারের অনুকূল অবস্থায় কাজ করেন কেবল তখনই তাঁরা সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্যক পালন করতে পারবেন।

বিজ্ঞানের সংরক্ষণ এবং প্রাথমিক দায়ভার বিজ্ঞানকর্মীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে কারণ কেবল তাঁরাই (এ) কাজের প্রকৃতি এবং কোন দিকে অগ্রগতি দরকার তা বোঝেন। অবশ্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের দায়িত্ব থাকবে যৌথভাবে বিজ্ঞানকর্মীদের এবং সাধারণ জনগণের উপর।"[৫]

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং পরে বিজ্ঞান কর্মীদের আন্দোলনের আরও কয়েকটি প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এদের ভিতর Pugwash আন্দোলনের, লিনাস পাউলিংএর নেতৃত্বে শান্তি আন্দোলনের, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং এর ভয়াবহ প্রয়োগের বিরুদ্ধে এবং জীবাণুযুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। পুগওয়াশ আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচারিত বার্ট্রাণ্ড রাসেল—আইনষ্টাইনের ইস্তাহার বলে পরিচিত দলিলটি। এই দলিলে সবরকম যুদ্ধবন্ধের আহ্বান জানানো হয়। এই দলিলের ভিত্তিতেই প্রথম পুগওয়াশ সম্মেলন ডাকা হয়। পাওয়েল, তোমোনাগা, র‍্যাবিনোভিচ প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের এই বিভিন্নধারার ভিতর কোনটি ভুল বা কোনটি নির্ভুল সে বিশ্লেষণ এ নিবন্ধের আলোচ্য নয়। এই সামগ্রিক ইতিহাসকে স্মরণে রেখে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানকর্মীরা কিভাবে তাঁদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করে গড়ে তুলতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই ইতিহাসের অবতারণা। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানকর্মীদের সমস্যার বিশেষ চরিত্র আছে, বিজ্ঞানের বিকাশের স্তর ও সমস্যাও ভিন্ন। তাই, ভারত বর্ষের বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের নিজস্ব ধারা আমাদের নিজেদেরকেই ঠিক করে নিতে হবে। বিশ্বসংগঠন তথা বিশ্বআন্দোলনের ইতিহাসের পর্যালোচনা সে কাজে কেবল সহায়তা করতে পারে।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীদের বর্তমান অবস্থাকে বুঝতে গেলে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের অতীতের ইতিহাসের দিকে একবার ফিরে তাকাতেই হবে। উন্নত দেশগুলির বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভিতর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ভারতবর্ষের মতন দেশগুলির উপর শোষণ ও লুণ্ঠণের সাহায্যেই ব্রিটেন ইত্যাদি দেশগুলি তাদের শিল্পবিপ্লব ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পন্ন করেছে, তাদের বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছে। আবার ঐ একই কারণে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বনিয়াদ চূর্ণ হয়েছে, বিজ্ঞান বিকশিত হতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবেই ভারতবর্ষের সমাজ নিজস্ব গতিসূত্র মেনে এগিয়ে যেতে পারেনি, পশ্চাৎপদ সমাজব্যবস্থা, চিন্তা ও দর্শনের ভিতর তা আটক পড়েছিল। সুতরাং দেখছি উন্নতদেশগুলির বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা উন্নতির চালিকা শক্তি, সেইগুলিই ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের বিকাশকে রুদ্ধ করেছে। এই বিপরীত সম্পর্ক আজও অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষের মত তৃতীয়বিশ্বের দেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্প উন্নত হতে থাকলে এবং এই দেশগুলি অনেকাংশে আত্মনির্ভর হয়ে পড়লে উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে বাধ্য—কারণ এখনও ঐ উন্নত দেশগুলি 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা রপ্তানি' করে, যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর সম্পদ 'সৃষ্টি' করছে। এই কারণেই উন্নতদেশগুলির শাসকশ্রেণী কখনই চায় না যে ভারতবর্ষের মত দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সত্যিকারের উন্নত হোক,

আত্মনির্ভর হোক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভার্ণা সম্মেলনের উদ্যোক্তা[৬] বিজ্ঞানকর্মী-সংস্থাগুলিও এই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারে নীরব। কিন্তু ভারতবর্ষের বিজ্ঞানকর্মীরা দেশের স্বার্থ এবং নিজস্ব পেশাগত সুবিধার জন্যই এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই বিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্যাগুলির সাথে আমরা আর একটি লক্ষ্যের জন্য জোর দিয়ে কাজ করে যেতে চাই—সে লক্ষ্যটি হল, বিজ্ঞানের বিকাশের পথের সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর করে তোলা। তুচ্ছ প্রয়োজনে বিদেশ থেকে ট্রেনিং, বিদেশ থেকে প্রেরণা এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করার যে প্রবণতা মহামারীর মতন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে সেটিকে দূর করতে হলে এই জাতীয় হীনমন্যতা ও বন্ধনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকর্মীদের ব্যাপক প্রচার, ব্যাপক আন্দোলন ও দৃঢ় সংগঠন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

উন্নত দেশগুলির বিজ্ঞান এবং আমাদের দেশের বিজ্ঞানের ভিতর আর একটি বড় পার্থক্য হল উন্নতদেশগুলিতে কম বেশী পরিমাণে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল বিদ্যমান যা স্বাধীন চিন্তার পক্ষে অনুকূল। আর আমাদের দেশে একদিকে সামন্ততন্ত্রের জোরদার অবশেষ, অপরদিকে সমস্যাসংকুল শাসকশ্রেণীর যৌথনিপীড়নে বিজ্ঞানকর্মীদের চিন্তার স্বাধীনতা এবং কর্মের স্বাধীনতা ক্ষয় পেয়ে পেয়ে লোপ পেতে বসেছে। সামন্ততন্ত্রের প্রভাবের দরুণ বিজ্ঞানের উপযোগী এবং বিজ্ঞানের উন্নতির পূর্বশর্ত বৈজ্ঞানিক দর্শন ও দৃষ্টিভংগী গড়ে উঠতে পারছে না, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্পে প্রয়োগের রাস্তা না পেয়ে বিজ্ঞান গবেষণাগুলি কল্পনাবিলাসী ও career গঠনের চাবিকাঠির চরিত্র অর্জন করছে।

গণতন্ত্রের অভাবে বিজ্ঞানকর্মীদের সৃজনশীলতার পূর্ণ স্ফুরণ হচ্ছে না এবং এই পরিবেশে সবচেয়ে মজা লুটছে বিদেশী (দেশী লেবেল লাগানো) বহুজাতিক সংস্থাগুলি—এরা শুধুমাত্র সরকারী নীতির মারফতেই নয়, উপরন্তু উপরের মহলের মুষ্টিমেয় দুর্নীতিপরায়ণকে কেন্দ্র করে চুটিয়ে 'ব্যবসা' করার সুযোগ পাচ্ছে।

বাস্তব পরিস্থিতির পার্থক্যের দরুণ মূলতঃ উন্নতদেশগুলির বিজ্ঞান কর্মীদের নিয়ে গঠিত ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের কার্যক্রম এবং ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীদের কার্যক্রম হুবহু এক হতে পারে না। এদিকে খুব সুন্দর ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন A.S.W-I. এর সম্পাদক রামপ্রসাদ—"আমাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে আমাদের আন্দোলনের ঢেউও পশ্চিমী দেশগুলি থেকে এসেছে এবং স্বভাবতঃই তা তারা (পশ্চিমী দেশগুলি) যে কায়েমী ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ে এখানকার মাটিতে এসে পা দিয়েছিল সেই স্বার্থগুলির সংগে সংগতি রক্ষা করে চলেছে।"[৭]

এই সামগ্রিক পটভূমিকায় আমরা বিচার করে দেখব ভারতবর্ষের বিজ্ঞানকর্মীরা ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নতি ও সঠিক প্রয়োগের জন্য এ পর্যন্ত কি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

প্রথমে আমরা ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেব। প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে পিছিয়ে তো ছিলই না, বলা চলে আগের সারিতেই ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিকতার কুফল হিসাবে সংকীর্ণমন্যতার দরুণ এবং বহুলাংশে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও অত্যাচারে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবধারাগুলিই ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ গুপ্তযুগের পর থেকেই ধারাবাহিক পতন চলতে থাকে। ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার সূত্রপাত করে ইংরেজরা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৮৫৪ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য 'উডের ডেস্‌প্যাচ' নামে শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়। তার তিনবৎসর পর সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯৫৮তে কোম্পানীর মালিকের হাত থেকে শাসনভার নিলেন বৃটিশ সরকার। উডের ডেস্‌প্যাচ অনুযায়ীই শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ চলতে থাকল।

এরিমধ্যে ১৮৩৫-এ কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ খোলা হয়। ১৮৩৯-এ পাটনায় প্রথম হসপিটাল খোলা হলেও ওখানে বাঁকিপুরে ১৮৭৪-এ মেডিক্যাল স্কুল খোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত এই স্কুলে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত।[৮] পাশাপাশি টেকনিক্যাল শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই সময়ের মধ্যে অল্প কলেজ খোলা হয়েছে। এই সমস্তই হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য—ভারতের জাতীয় অর্থনীতির সম্যক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর কার্যক্রম বিদেশী সরকার গ্রহণ করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে অনেক পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—ভারতীয়দের এর জন্য সরকারের কাছে চাপসৃষ্টির জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। ইংরেজ সরকারের এই সব প্রচেষ্টার পাশাপাশি ভারতীয়দের নিজস্ব উদ্যোগে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা প্রসারের আরেকটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৬-এ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয় ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে। এই ভারতীয় প্রচেষ্টার ধারাটিই বিশেষ জোরদার হয়ে উঠল ১৯০৪ সালে কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে উপলক্ষ্য করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাতীয়তাবাদী শিক্ষার জন্য বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষার জন্য স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার আন্দোলন চলতে থাকল। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯০৬ সালে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের উদ্যোগে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হল। ঐ একই বছরে সোসাইটি ফর প্রমোশন অব্ টেক্‌নিক্যাল এডুকেশনের উদ্যোগে স্থাপিত হল বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট। এই বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের বাড়ীতেই এখন রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ।

জাতীয়তাবাদী শিক্ষা প্রসারের এই আন্দোলন ঐ সময় শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না—ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞান প্রসারের আন্দোলনের এই ধারাটি দীর্ঘস্থায়ী হল না। বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও প্রতিফলিত হ'ল। আন্দোলনের নেতৃস্থানাধিকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবর্গের সামাজিক অবস্থান এর জন্য অনেকটাই দায়ী ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও জাতীয়তাবাদী শিক্ষা আন্দোলনকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। জাতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা যে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য নয়, জাতীয়তাবাদী শিক্ষা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সেই কথাটা পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এল।

জাতীয়তাবাদী শিক্ষা আন্দোলনের একটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ কৃষি সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণার কোন কার্যক্রম এই আন্দোলনের ভিতর ছিল না। অবশ্য পরে রবীন্দ্রনাথ এ দিকে নজর দিয়েছিলেন। ভারতে কৃষি বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করার গৌরবের অধিকারী হলেন একজন মার্কিন—হেনরি ফিপ্‌স্‌। তিনি ইংরেজ সরকারকে ত্রিশহাজার পাউণ্ড দেন—যার থেকে কুন্নুরে পাস্তুর ইনষ্টিটিউট এবং পুসায় কৃষি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা জাতীয় অর্থনীতির যে খসড়া পরিকল্পনা [বোম্বে প্ল্যান] রচনা করেছিলেন তার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে অংশটি লক্ষ্যণীয়। এই খসড়া পরিকল্পনাতে বিজ্ঞান নীতির বিশদ বিবরণ নেই, তবুও শাখা সমিতিগুলির প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করলে জাতীয় নেতাদের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞাননীতি সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির রসায়ন শিল্প শাখা সমিতির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

"আমাদের জাতীয় আর্থিক কাঠামোর চারটি অত্যাবশ্যকীয় দিক থেকে এই রাসায়নিক শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ আধুনিককালে রাসায়নিক শিল্প সর্বতোভাবে যে কোন দেশরক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড স্বরূপ। শারীরিক সামর্থ্য বা পেশীবলের দিন আর নেই—এ যুগে আনবিক বোমাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অস্ত্র। নানারকম আধুনিকতম সংগতি ও আয়ুধের জোরেই যুদ্ধ জয় সম্ভব। শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে উন্নতদেশের পক্ষেই এই সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্ভব।"* এ বক্তব্য ছিল ঐ শাখাসমিতির সভাপতি ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের। জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞান আন্দোলনের সংগে যুক্ত এক সম্প্রদায়ের মনোভাব এই উদ্ধৃতির ভিতর লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় জনগণ, বিশেষ করে সাধারণ বিজ্ঞানকর্মীরা আশা করে রয়েছেন স্বাধীনতার পরে ভারতে সত্যিকারের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটবে এবং তা জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করবে। আর অন্যদিকে 'যুদ্ধের জন্য বিজ্ঞান' জাতীয় নেতাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাচ্ছি। লক্ষ্যণীয়, এই দৃষ্টিভংগী হচ্ছে একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকর্মীর। ইংরেজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যে সব বৈজ্ঞানিক বের হয়েছিলেন তাঁদের এক প্রভাবশালী অংশ এই ধরনের মানসিকতার থেকে মুক্ত ছিলেন না। ব্যতিক্রম হিসাবে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে সংগঠিত বৈজ্ঞানিকদের একাডেমিক সংগঠনগুলি এই সব প্রভাবশালী বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই কারণেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংগঠন ভারতীয় বিজ্ঞানকংগ্রেস জাতীয় ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করতে বিফল হয়েছে—এর বার্ষিক সম্মেলনগুলি ব্যয় বহুল হলেও উদ্দেশ্যহীন পিক্‌নিকের চরিত্র অর্জন করেছে।

এই পর্যালোচনার ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের যে ধারাগুলি চলছিল তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় কায়েমী স্বার্থের প্রভাব ছিল এবং কি সরকারের বিজ্ঞাননীতিতে কি বিজ্ঞানের প্রগতি আন্দোলনের কর্ণধারদের চিন্তায় স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সাধারণ জনসাধারণ বিজ্ঞানের দ্বারা কি ভাবে উপকৃত হবে সেটা তো দূরের কথা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা সরাসরি ভাবে যুক্ত সেই বিজ্ঞানকর্মীদের দুরবস্থার দিকে কর্ণধাররা দৃষ্টিপাতই করেন নি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে উর্ধতনদের স্বৈরাচার ও দুর্নীতি বিজ্ঞানকর্মীদের বিক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সাধারণ বিজ্ঞানকর্মীরা ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন ডঃ জোসেফ বা বিনোদশাহের আত্মহত্যার পথ এবং সংগঠিত আন্দোলনের পথের ভিতর কোন পথটিকে তাঁরা বেছে নেবেন। স্বাভাবিকভাবে সংগঠিত আন্দোলনের পথেই তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৭-এ ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অব ইণ্ডিয়া (A.S.W.I) গঠিত হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতে বিজ্ঞানকর্মীদের যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছে তাতে ASWI-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৪৭-এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্লেনারী সেশনে দিল্লীর CSIR-এর বিজ্ঞানকর্মীদের 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন' এবং কলকাতার 'সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া' মিলিত হয়ে ASWI গঠিত হয়। এর অস্থায়ী কার্যকরী সমিতিতে মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এইচ্‌ জে ভাবা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ছিলেন এবং সভাপতি ছিলেন জহরলাল নেহরু। ASWI-এর সংবিধানে এই সংগঠনের কর্তব্য ও লক্ষ্য হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। সেগুলির মধ্যে রয়েছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানের সার্থকতম প্রয়োগ এবং সমস্ত স্তরের বিজ্ঞানকর্মীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পেশাগত অবস্থার সংরক্ষণ ও উন্নতি। ট্রেড্‌ ইউনিয়ন হিসাবে কাজ করার কথাও সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৯ সালে ASWI-

এর মুখপত্র হিসাবে 'বিজ্ঞানকর্মী' প্রকাশিত হতে শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে সহজবোধ্য করে প্রচারের কাজও 'বিজ্ঞানকর্মী'র একটি লক্ষ্য ছিল। ১৯৪৮-এ ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ভারতীয় জাতীয় কমিশনের বৈজ্ঞানিক সাবকমিশনে ASWI প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়। UNESCO-র সংগে সহযোগিতায় এই সংগঠন কাজ করতে থাকে। মেঘনাদ সাহা ১৯৪৯-এ এই সাবকমিশনের সভাপতি হন।

একদিকে সরকার ASWI কে স্বীকৃতি দেয় এবং অন্যদিকে ASWI-এর নেতৃত্ব বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সালে কিরকীর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর বিজ্ঞানকর্মীদের দাবী আদায়ের জন্য ASWI যোগ্য নেতৃত্ব দেয় এবং দিল্লি ক্লথ মিলসের বিজ্ঞানকর্মীদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্যও ASWI অগ্রণী হয়। ASWI-এর সংগঠন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পাঁচ বছরের ভিতর ১৭টি শহরের ৪১টি প্রতিষ্ঠানে এবং ৩টি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে ASWI সংগঠন গড়ে ওঠে।[১০]

ASWI এর সংগঠনের জন্য দেশের বিখ্যাত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বিশেষ করে মেঘনাদ সাহা, বি সি গুহ এবং হোমি ভাবার অবদান উল্লেখ করতে হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জুলিও কুরী, জে ডি বার্ণাল, পি. এম. ব্ল্যাকেট এবং জে বি এস হালডেনের সহযোগিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জহরলাল নেহেরুর সহযোগিতা ASWI সব সময়ই পেয়ে এসেছিল। বিজ্ঞানকর্মীদের বিশ্বসংগঠনের সংগে ASWIএর সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই। 'বিজ্ঞানকর্মী'র প্রথম সংখ্যাতে WFSW এর সম্পূর্ণ সনদ এবং প্রাগ এ ১৯৪৮-এ জুলিও কুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছাপা হয়। ASWI ওয়ার্ল্ডফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট সংগঠন হিসাবে কাজ করতে থাকে; এখনও ASWI এই সংগঠনের সংগে সম্পর্কিত আছে। যদিও ASWI প্রথমদিকে সরকারী আনুকূল্য এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা পেয়েছিল, তবু ASWI সরকারের বিজ্ঞাননীতির সংগে একমত পোষণ করত না। জাতীয় অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানের ব্যাপারে ASWI যে সমস্ত কার্যক্রম আজও নিয়ে চলেছে তার মধ্যে ভারতীয় জনগণের স্বয়ম্ভরতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। ASWI কোন সময়েই ট্রেড্ইউনিয়নসর্বস্ব আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। ১৯৭২-এর ২৪তম অধিবেশনে ASWI যে ত্রিবিধ কর্মসূচী ঘোষণা করে তার ভিতর ছিল সাংগঠনিক কাজ, প্রকাশনার কাজ, এবং বিজ্ঞান চক্র গঠন। বিজ্ঞান চক্রের কাজ প্রথম শুরু হয় WFSW-এর দিল্লী আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংগে সহযোগিতায়। এই রকম বিজ্ঞান চক্রগুলির আলোচনার ভিতর থেকে যে তথ্যাদি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই সরকারী কমিটি এবং পে কমিশনের কাছে স্মারক লিপি পেশ করা হয়। ASWI-এর মহীশূর, ধানবাদ, লক্ষ্ণৌ, ইত্যাদি শাখাগুলি নিয়মিতভাবে এই রকম বিজ্ঞানচক্রের কর্মসূচী চালিয়ে আসছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের দুরবস্থার কারণগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করে ASWI-এর বিভিন্ন সংগঠনে বিশেষ করে CSIR-SWA-এর মহীশূর শাখার উদ্যোগে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছে। শেষোক্ত শাখা CSIR এর কাছে খোলাখুলি দাবী জানিয়েছেন যে CSIR যেন পুরোপুরি দেশীয় প্রযুক্তির সাহায্যে গঠিত শিল্প কাঠামো তৈরীর ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। ASWI এর বুলেটিনে এবং CSIR-SWAর 'Courier'-এ বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ বিজ্ঞানকর্মীদের সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। বহুলপ্রচারিত অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে ASWI-এর নেতৃবৃন্দের বিজ্ঞাননীতি ও বিজ্ঞানের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত এবং দৃষ্টিভংগী জনগনের মধ্যেও কিছুটা পৌঁছুতে পেরেছে। এ বিষয়ে 'সায়েন্স টুডে' তে এবং হিন্দী ভাষার 'ধর্মযুগে' প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলন যত বেশী ব্যাপক ও গভীর হচ্ছে, কায়েমী স্বার্থ তত বেশী সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের বিরোধিতায় নামছে। সি. এস. আই. আর সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়াম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও নেতৃত্বদানকারী কর্মীদের ওপর নানা ধরণের দমনপীড়ন এর সাক্ষ্য বহন করে।

এই ধরনের ঘটনাগুলোর থেকে এই শিক্ষাই বেরিয়ে আসে যে এককালে সরকারী আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতার একটা ভংগী থাকলেও বিজ্ঞানকর্মীদের দাবীদাওয়ার ব্যাপারে বা কায়েমী স্বার্থ বিরোধী প্রচারের দরুন কর্তৃপক্ষ ও সরকার বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলনকে মোটেই শুনজরে দেখেন না। বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনকে সফল করতে হলে এই ধরণের সরকারী প্রচেষ্টার এবং কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার জরুরী হয়ে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় সংস্থা ASWI-এর কার্যকলাপ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৬-এ ASWI-এর জব্বলপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী শাখা জরুরী অবস্থাকালিন গণতন্ত্র নিধনকে এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সমর্থন জানায়। বলা হয় গণতন্ত্রকে এই ভাবে খর্ব করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।[১১] এটি বিজ্ঞানকর্মী আন্দোলনের একটি দুর্বলতার দিক। এই দুর্বলতগুলি দূর করার জন্য ASWI-র প্রচার ও সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার অবকাশ আছে।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সংস্থা ASWI ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্থার প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানকর্মীরা অন্যায় আর অবিচারের

বিরুদ্ধে লড়েছেন। এগুলির মধ্যে কলকাতার কয়েকটি সংস্থা যেমন, সাহা ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞান কর্মীদের, বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনিকাল মিউজিয়ামের কর্মীদের, IACS-এর বিজ্ঞান কর্মীদের ও CGCRI-র বিজ্ঞানকর্মীদের আন্দোলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আন্দোলনগুলি থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে সর্বস্তরের বিজ্ঞান কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়।

এ ছাড়া বিজ্ঞানকর্মীদের সব সময়ই একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন না হলে, শিল্পের উন্নতি না হলে বিজ্ঞানের বিকাশ বা চাহিদা সৃষ্টি কোনটাই সম্ভব নয়। আর এই জাতীয় অর্থনীতির পথে বাধা স্বরূপ শক্তিগুলির ভিতর সবচেয়ে ক্ষতিকারক দুইটি শক্তি সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের যে সংগ্রাম তার সংগে যুক্ত হবার সবরকম প্রচেষ্টাই বিজ্ঞানকর্মীদের করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিজ্ঞানকর্মীদের নিজস্ব দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে জংগী আন্দোলন এখন বিশেষ সাড়া জাগাতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে ভারতীয় জনগণের সেবার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে তা অবশ্যই জনমানসে সাড়া জাগাবে, আর কেবল সেই পটভূমিকাতেই বিজ্ঞানকর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক সুবিধা এবং সৃজনশীল দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

বিজয় সরকার

সূত্রপঞ্জী—

১. টেনর এফ্ শেরউড, 'সায়েন্স পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট' পৃঃ ২৬৪
২. রামপ্রসাদ, সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স মুভমেন্ট, পাস্ট, প্রেজেন্ট এণ্ড ফিউচার BASW, ভলুম ৩, ১৯৭৩ পৃঃ ৯৯
৩, সাকাতা, এস, "মাই ক্লাসিক্স-এংগেলস্ ডায়ালেকটিক ডেআর নাটুর।" সাপ্লিমেণ্ট অব্ দি প্রগ্রেস অব্ থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স নং ৫০, ১৯৭১, পৃঃ ২২
৪. তাকেতানি এস—মেথোডো লজিক্যাল অ্যাপ্রোচেস্ ইন দি ডেভেলাপমেণ্ট, ঐ পৃঃ ৩
৫. বার্ণাল জে ডি—সায়েন্স ইন্ হিষ্ট্রি ভলুম ৪, পৃঃ ১২৯১
৬. ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে বুলগেরিয়ার ভার্ণাতে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্সের (WFSW) উদ্যোগে "সায়েন্টিস্ট ইন সোসাইটি" বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।
৭. রামপ্রসাদ, BASWI ভলুম ৩, ১৯৭৩ পৃঃ ৯১
৮. ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস হ্যাণ্ডবুক ১৯৩৩ পৃঃ ১২৩
৯. জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গ্রন্থমালা, রাসায়নিক শিল্প (১৯৪৮) পৃঃ৩
১০. BASWI ভলুম ৬, জুন ১৯৭৭, পৃঃ ৮৩-৮৭
১১. BASWI ভলুম ৬, ১৯৭৬ পৃঃ ৩২

[নিবন্ধ রচনায় অংশুতোষ খান ও সুনীল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেছে]

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য :

(১) দেশের জনগণের স্বার্থে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগানো।
(২) বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগকে উদ্‌ঘাটিত করা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।
(৩) বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে সামাজিক চেতনা গড়ে তোলা।
(৪) বিজ্ঞান কর্মীদের মধ্যে ও জনগণের অন্যান্য অংশের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মতৈক্য সৃষ্টি করা।
(৫) বিজ্ঞান কর্মীদের পেশাগত অবস্থার উন্নয়ন এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সমস্ত সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া এবং অন্যান্যদের সঠিক সংগ্রামে সমর্থন ও সংহতি জানানো।

বিজ্ঞানকর্মীদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণা

[বিজ্ঞান কর্মীদের আন্তর্জাতিক সংস্থা WFSW-এর এই দলিলটি আমরা প্রকাশ ক'রছি এখানকার বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার ও মতামত গঠনের জন্য। আমাদের দেশে বিজ্ঞানকর্মীদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা রচনা করার ও তা কার্যকর করার কাজে এই দলিলটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। পরিসরের অভাবে দলিলের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ বাদ দেওয়া হ'য়েছে]

.....'বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্বসংস্থা' (World Federation of Scientific workers—W.F.S.W.) প্রধানতঃ বিজ্ঞান এবং কারিগরীর ফলপ্রসূ উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এর সর্বাধিক পরিচালনের ব্যাপারে উৎসাহী। এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করতে গিয়ে W.F.S.W-এর উপলব্ধি হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষিত বিজ্ঞানকর্মীদের কাজের জন্য যথোচিত পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালে একটি খসড়া-প্রস্তুতকারী কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিটির কাজ ছিল বিজ্ঞানকর্মীদের মৌলিক অধিকারগুলি নির্দেশ করা যার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্বাধুনিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হবে এবং যা সাধারণভাবে গ্রহনীয় হবে। W.F.S.W-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলি হোলো বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশাগত সমিতি। এই সংগঠনগুলি যেসব দেশের অন্তর্গত সেইসব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পার্থক্য। তবুও, এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে প্যারীসে W.F.S.W.-র সাধারণ পরিষদ যখন মিলিত হয় তখন সেখানে বিজ্ঞানকর্মীদের অধিকার সংক্রান্ত এই ঘোষণাটি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে গৃহীত হয়। ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা উভয়েই ইতিমধ্যে ঘোষণাটিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আশা করা হচ্ছে যে, কালক্রমে এই ঘোষণাটির থেকে একটি "আন্তর্জাতিক সুপারিশ" বেরিয়ে আসবে যা সরকারগুলির দ্বারা অনুমোদিত হবে—যেমনটি হয়েছিল ১৯৬৬ সালে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে।

১. প্রস্তাবনা

বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানবজাতির অবস্থার উন্নতির জন্য ক্রমবর্দ্ধমান সহায়তার ভূমিকা পালন করতে পারে, কল্যাণমূলক কাজের নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে এবং সমাজের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলির সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-শিক্ষা বর্তমানে ক্রমবর্দ্ধমানহারে প্রসারলাভ করছে, এবং এর ফলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারলব্ধ বিপুল শক্তি যাতে মানবজাতির প্রয়োজন মেটানোর কাজে প্রযুক্ত হয় তা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা আনুপাতিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-শিক্ষকদের পেশার কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি এই সব কর্মীদের মহান সামাজিক দায়িত্ব থেকেই উদ্ভূত। একদিকে যেমন বিজ্ঞান এবং তার লব্ধ ফলাফলকে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণের কাজে, অথবা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সমাধানের কাজে ব্যবহারের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে; অন্যদিকে, মানব-জাতির মুখ্য স্বার্থের পরিপন্থী কাজে, যেমন জন-বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রস্তুতি অথবা একদেশ কর্তৃক অন্যদেশকে শোষণের জন্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলগুলি ব্যবহৃত হওয়ার বিপদও বর্তমান। বিজ্ঞানের এই দুই পরস্পরও বিরোধী প্রয়োগের সম্ভাবনা বিজ্ঞানকর্মীদের ক্রিয়াকলাপকে বিশেষভাবে তাৎপর্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ প্রয়োগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শান্তিকে সুরক্ষিত করা এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে অংশগ্রহনের ব্যাপারে বিজ্ঞানকর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২. সাধারণ আলোচনা

২.১. সংজ্ঞা

বিজ্ঞানকর্মী বলতে বোঝা যাবে যথোপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তিকে, যিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পেশাদারী কাজে নিযুক্ত :

(১) প্রাকৃতিক, কারিগরী অথবা সমাজ বিজ্ঞান।

(২) মৌলিক অথবা ফলিত বিজ্ঞান।

(৩) বিজ্ঞানে শিক্ষকতা।

২.২. যোগ্যতার প্রকৃতি :—

একজন পেশাদার বিজ্ঞানকর্মীকে যথোপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা

বিজ্ঞানগবেষকদের মর্যাদা সম্পর্কে ইউনেসকোর সুপারিশ

[১৯৭৪ সালের ২০শে নভেম্বর ইউনেস্কো এই সুপারিশ গৃহীত হয়। সুপারিশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা পাঠকদের জন্যে অনুবাদ করে দিচ্ছি। পাঠকদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এর ওপর মতামত পাঠান।]

বিজ্ঞাননীতি উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানগবেষকমণ্ডলী

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের উচিৎ বিজ্ঞান আর কারিগরীকে দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক উন্নতিতে ব্যবহার করা আর [এইভাবে] সংযুক্ত জাতিপুঞ্জের আদর্শ ও লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের উচিৎ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী নীতিকে বাস্তবায়িত করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী, প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্রপাতিতে নিজেদের সজ্জিত করা যাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টাগুলো জাতীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগে, আবার একই সাথে, বিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসাবেই যথাযোগ্য গুরুত্বও পায়। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে গৃহীত নীতির মধ্যমে, সাধারণ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরীকে ব্যবহার করার মাধ্যমে আর বিশেষভাবে, বিজ্ঞান গবেষকদের প্রতি মনোভাবের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রদের দেখাতে হবে যে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক কাজকর্ম বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়, অধিকতর মানবিক ও ন্যায়সংগত সমাজসৃষ্টির কাজে জাতীয় প্রচেষ্টার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

সাধারণভাবে জাতীয় নীতি প্রণয়নের আর বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরী নীতি প্রণয়নের প্রতিটি ধাপেই সদস্য রাষ্ট্রদের উচিৎ

(ক) বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় সরকারী অর্থকে জাতীয় বিনিয়োগ হিসাবে দেখা যার থেকে ফল পাওয়া যেতে পারে একমাত্র দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই

(খ) ঐ ধরণের সমস্ত খরচেরই প্রয়োজনীয়তা তথা অপরিহার্যতা যাতে সবসময় জনসাধারণের মতামতের মাধ্যমে যাচাই হতে পারে তার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

....

সদস্য রাষ্ট্রদের উচিৎ জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার উন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়নে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের এই বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিৎ যাতে এ কাজে প্রতিষ্ঠানগত স্তরে বিজ্ঞান গবেষক ও তাঁদের পেশাগত সংগঠনসমূহের যথাযোগ্য উপদেশ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রচলিত ব্যবস্থাদির সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের নিজের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ যাতে জনসাধারণের অর্থে সাহায্যপুষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ব্যবহারিক অগ্রগতির কাজে গবেষকরা জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকতে স্বীকৃত হন, আবার একই সাথে, তাঁদের কাজে এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরীর অগ্রগতির জন্য যে পরিমাণ স্বাধীনতা প্রয়োজন তা তাঁরা ভোগ করেন। এ বিষয়ে পুরোপুরি দৃষ্টি রাখতে হবে যে জাতীয় বিজ্ঞান নীতির অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান গবেষকদের সৃজনশীল কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার স্বাধীনতা আর স্বায়ত্তশাসনের প্রতি যথাসম্ভব শ্রদ্ধাশীল মনোভাব নিয়ে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য.....সংশ্লিষ্ট সদস্য রাষ্ট্রদের উচিৎ এমন ধরণের সাধারণ আবহাওয়া সৃষ্টি করা আর বৈজ্ঞানিক গবেষকদের নৈতিক ও বৈষয়িক উৎসাহ তথ সাহায্য দানের জন্য এমন সব বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে

(ক) উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন তরুণরা এই বৃত্তির প্রতি যথেষ্ট আকর্ষিত হন এবং বিজ্ঞান গবেষণা ও ব্যবহারিক অগ্রগতির কাজকে পেশা হিসাবে নেওয়ার ব্যাপারে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বোধ করেন, যার ফলে জাতির প্রয়োজন মেটানোর মতো বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কর্মীর ক্রমাবর্তন অব্যহত থাকে

(খ) রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে থেকে এমন এক দল বৈজ্ঞানিক গবেষকের আবির্ভাব হয় ও তাঁদের বিকাশ ত্বরান্বিত হয় যাঁরা তাঁদের নিজেদের কাছ থেকে আর সারা পৃথিবীতে তাঁদের অন্যান্য সতীর্থদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কর্মী সম্প্রদায়ের যোগ্য সদস্য হিসাবে শ্রদ্ধা পান।

বিজ্ঞান গবেষকদের বৃত্তি

সদস্য রাষ্ট্রদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে বিজ্ঞান গবেষকদের বৃত্তির প্রতি আনুগত্য প্রবলতর হবে তখনই যখন তাঁরা তাঁদের কাজকে তাঁদের

দেশবাসীর আর সমগ্র মানব জাতির, উভয়ের প্রতিই সেবা হিসাবে দেখতে অনুপ্রাণিত হবেন।.....

.....সদস্য রাষ্ট্রদের এমন ধরণের অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করা উচিৎ যাতে বৈজ্ঞানিক গবেষকরা জনকর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও অধিকার বহন করেন :

(ক) চিন্তাগত স্বাধীনতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে তাঁরা যেভাবে দেখছেন তার স্বপক্ষে দাঁড়ানো, আর তাকে তুলে ধরা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

(খ) তাঁরা যেসব প্রকল্পে রয়েছেন সেগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রণয়নে অংশগ্রহণ করা ও তা কার্যকর করার এমন ধরণের পদ্ধতি স্থির করা যা মানবিকভাবে, সামাজিকভাবে ও পরিবেশগতভাবে দায়িত্ববোধের ছাপ বহন করে

(গ) বিভিন্ন প্রকল্পের মানবিক, সামাজিক ও পরিবেশগত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা, ও চূড়ান্ত ধাপ হিসাবে এগুলি থেকে সরে দাঁড়ানো, যদি তা তাঁদের বিবেকের নির্দেশ হয়

(ঘ) তাঁদের নিজেদের দেশের বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কাঠামোয় এবং জাতীয় লক্ষ্য সাধনে গঠনমূলকভাবে অংশগ্রহণ করা.....এবং জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক আদর্শ ও লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষকের সৃজনশীল কাজে অনুপ্রেরণা দানের বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রদের সক্রিয় ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

[সুপারিশের পূর্ণ বয়ান 'বুলেটিন অফ দি অ্যাসোসিয়েশন অফ সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অফ ইণ্ডিয়া' মার্চ, ১৯৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে]

পুস্তক পরিচিতি

হোয়াট ইজ সায়েন্স ফর ?—বিজ্ঞান কিসের জন্য ?

লেখক : বার্নর্ড ডিক্সন। পেঙ্গুইন প্রকাশন।

সমকালিন বিজ্ঞান চর্চার তীক্ষ্ণ সমালোচক 'নিউ সায়েন্টিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদকের কলম থেকে আসা আলোচ্য বইখানি, বিজ্ঞান চর্চার সামাজিক দিক সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী সেই সমস্ত সাধারণ পাঠক এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে, নিঃসন্দেহে সাড়া জাগাবে।

প্রত্যাশিতভাবেই, বইটির লেখ-শৈলী সাংবাদিকতার সহজ, স্পষ্ট এবং খোস-গল্প করার মেজাজ ছোঁয়ানো। কিন্তু বইটি পর্যালোচনা করার আগে পাঠকদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। ডিক্সন মুখবন্ধতে তাঁর 'প্রিয় অপছন্দগুলির' মধ্যে বইয়ের 'অলিখিত অংশের তীব্র সমালোচক—পুস্তক পর্যালোচক ব্যক্তিটিকে' অন্তর্ভূক্ত করে যে স্মারকটি রেখেছেন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার দায় এই পর্যালোচক নিতে নারাজ। তাই কোন ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে না গিয়ে, আলোচ্য বইটিতে যা আছে শুধু তারই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু দিক এখানে তুলে ধরতে চাই।

প্রথমতঃ বইটির রূপরেখার প্রসঙ্গে আসা যাক। এ সম্পর্কে ডিক্সন নিজেই বলেছেন : বইটি 'সমাজ ও বিজ্ঞানে'র ওপর লেখা কোন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ নয়। বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এমন একজন সাংবাদিকের চোখ দিয়ে দেখা কয়েকটি প্রশ্ন, যেমন—বিজ্ঞান কি, বিজ্ঞানীরা কিভাবে কাজ করেন.....এবং সমকালিন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভিতর এবং বাইরে থেকে বিজ্ঞানকে নিয়ে যে সমালোচনার ঝড় আজকে বইছে—এইরকম কিছু বিষয় নিয়েই বইটির অবতারণা।

বলা নিষ্প্রয়োজন, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানগত এবং কর্মধারাগত জটিলতা এবং সমাজের সাথে তার সূক্ষ্ম অথচ অতি নিবীড় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জাল ভেদ করে সামাজিক বিজ্ঞান চর্চাকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন তা ডিক্সনের আছে। বিজ্ঞানকর্মী এবং সচেতন সাংবাদিক এই দ্বৈত ভূমিকা বিজ্ঞানকে ভেতর ও বাইরে থেকে দেখতে পারার মত সুযোগ ও দক্ষতা তাঁকে দিয়েছে। এবং এই সূত্রে ডিক্সনের মতামতের সাথে সম্পূর্নত একমত না হ'লেও, পশ্চিমী দুনিয়ার আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বহু সামাজিক প্রশ্ন যা তিনি বিপুল তথ্যের মাধ্যমে বইটিতে পরিবেশন করেছেন—আমাদের কাছে ভাবনার খোরাক জোগাবে।

মূল বিষয় হিসেবে দেখলে বলা যায়—পরিবেশ দূষিকরণ (environmental pollution) থেকে শুরু করে ভয়াবহ মরণাস্ত্র সৃষ্টির জনক হিসেবে বিজ্ঞান পশ্চিম দুনিয়ার জনগণের সামনে সাম্প্রতিক-কালে যে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন এবং এরই একটি চরম রূপ হিসেবে যে বিজ্ঞান চর্চা বিরোধ আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছে, তারই পটভূমিতে দাড়িয়ে লেখক একদিকে যেমন প্রচলিত বিজ্ঞান চর্চার স্বরূপ উন্মোচন

করেছেন, অন্যদিকে তেমনি, নিছক আবেগচালিত বিজ্ঞান বিরোধী মনোভাবের ক্ষতিকর দিকগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে বিজ্ঞানের কল্যাণকর ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সঠিক দিকটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। স্বভাবতই এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিই 'সর্বজনসম্মত বিজ্ঞানে'র বিষয়টিকে নতুন করে পর্যালোচনা করতে বাধ্য করেছে লেখককে যেমন—বিজ্ঞান কি, 'রহস্যময়' বিজ্ঞানীরা কিভাবে তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম করে থাকেন, বিজ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশের রাস্তা কি, বিজ্ঞান গবেষণার খরচ কারা দেয় এবং কেন দেয়, বিজ্ঞানীদের প্রতি সমাজের অন্যান্য অংশের দৃষ্টিভঙ্গী কি, প্রচলিত বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর সামাজিক ভূমিকা কি, প্রতিষ্ঠানগত বিজ্ঞানের ভেতরে ও বাইরে যে আন্দোলনগুলি চলছে সেগুলির উৎস ও স্বরূপ কি, ইত্যাদি। এককথায়, লেখক সমকালীন বিজ্ঞান চর্চার একটি বাস্তবানুগ চিত্র এঁকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে তিনি প্রচলিত বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার দিকগুলি, আবেগচালিত হয়ে নয়, যুক্তিগতভাবে ভেবে দেখেন এবং সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্যকে রূপ দিতে গিয়ে লেখক সমগ্র বিষয়টিকে এগারোটি পরিচ্ছদে ভাগ করেছেন। এগুলির উল্লেখ করছি কারণ বইটির সুন্দর সামাজিক পরিকল্পনাটি এর থেকেই বেরিয়ে আসে এবং পাঠকও বিষয়টি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারনা পেতে পারেন। পরিচ্ছদগুলি হল যথাক্রমে: উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা (Ferment and uncertainty), বিজ্ঞান-শিল্পশিক্ষা ও তার পুরস্কার প্রাপ্তি (Learning the craft and its rewards), বিজ্ঞান ও সমাজ (Science and Society), পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি (Reason in Persepective), বিজ্ঞান আক্রান্ত (Science under attack), পেমাষ্টার (Pay-master), সিদ্ধান্ত, চাপ সৃষ্টি ও সংঘাত (Decisions, Pressures & conflicts), ভেতর থেকেই মতভেদ ও অশান্তি (Dissent and disquiet from within) এবং বিজ্ঞান কিসের জন্য ? (What is Science for ?) আলোচ্য বিষয়গুলি পরিচ্ছেদ শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট। প্রতিটি পরিচ্ছেদরই বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রচুর তথ্য ও ঘটনার সমাহার—যার মধ্যে এমন কিছু সাড়া জাগানো খবরও ছড়িয়ে আছে যেগুলি সংগ্রহ করা নিউ সায়েন্টিষ্ট পত্রিকার তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা ও ডিক্সনের মতো পেশাদার বিজ্ঞানী সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব। পাঠক-মণ্ডলী যাতে বইটি সম্পর্কে কিছুটা বস্তুনিষ্ঠ ধারনা পেতে পারেন তার জন্য কয়েকটি পরিচ্ছদ সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

বিজ্ঞানকে সামরিক ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার কয়েকটি তথ্যনিষ্ঠ কাহিনী পেমাষ্টার (Pay-master) অংশটিতে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: নাসার এ্যাপোলো প্রকল্পের চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বরের অন্তরালবর্তী ঘটনা, যে কনকর্ড বিষয়কে নিয়ে এতো হৈ চৈ শোনা যায় তার সৃষ্টির রাজনৈতিক নেপথ্য কাহিনী, এবং আমেরিকান ক্যান্সার রিসার্চ প্রকল্পের আসল পটভূমি যা তথ্যনিষ্ঠভাবে ডিক্সন প্রমাণ করেছেন, দলীয় রাজনৈতিকস্বার্থ ও বর্ণবৈষম্যকে জিইয়ে রাখার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য বইটির বিশেষ করে, সিদ্ধান্ত, চাপসৃষ্টি ও সংঘাত, বিজ্ঞান আক্রান্ত এবং ভেতর থেকেই মতভেদ ও অশান্তি এই তিনটি পরিচ্ছদ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

প্রথমটিতে ডিক্সন বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতহীন সংকীর্ণ ধারনা রয়েছে সেটিকে উন্মোচন করেছেন এবং প্রতিষ্ঠানগতভাবে এই ধারনার প্রতিফলন কি ভাবে ঘটছে তা নিয়ে বিষদ আলোচনা করেছেন।

সমাজের অন্যান্য আশু প্রয়োজনগুলির প্রতি অসচেতন থেকে অবাস্তব, অনাবশ্যক (বহুক্ষেত্রে), চিন্তাহীন এবং চোখ-ধাঁধানো গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থে বিজ্ঞানকে যেভাবে বিপুল সামাজিক অর্থ বিনিয়োগের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে মোহোল (Mohole) ঘটিত কেলেঙ্কারী এবং ষাট দশকের শেষের দিকে বৃটেনে ৩০০ জি. ই. ভি প্রোটন এ্যাকসিলারেটর (300 Gev Proton Accelerator) তৈরী করার প্রস্তাবটির সমাজ অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক উঠেছিল তার বিস্তারিত ঘটনা। বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমকে কি ভাবে এই জাতীয় সংকীর্ণ বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীস্বার্থে নিযুক্ত করা হয় তার ওপরও একটি তথ্যসমন্বিত আলোচনা এখানে পাওয়া যায়। মোহলের ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। Mohole কথাটি Hole down to the Mohorovicic discontinuity-র সংক্ষেপীকরন। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ভূবিজ্ঞানের ওপর উপস্থাপিত প্রকল্প-প্রস্তাবগুলি আলোচনা করার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার (National Science Foundation) যে প্যানেল মিটিং হয় তাতে এই প্রকল্পটি জন্ম নেয়। পটভূমিতে ছিল—পদার্থবিজ্ঞান, রাসায়ন ও অন্তরীক্ষ গবেষণার (Space Research) তুলনায় ভূবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত অবস্থান এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে ভূবিজ্ঞানীদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হতাশা এবং হীনমন্যতাবোধ। দু'দিনব্যাপী এই আলোচনার শেষে ভূবিজ্ঞান ওয়াল্টার মাঙ্ক (Walter Munk) একটি দুর্ধর্ষ, অভিনব এবং চাঞ্চল্যকর প্রকল্পের প্রস্তাব করেন—যা জনসাধারণের মধ্যে তৎক্ষণাৎ সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন—প্রস্তাবটি ছিল: ভূত্বক (Earth crust) থেকে ম্যান্টল (mantle) পর্যন্ত সরাসরি একটি গর্ত খোঁড়ার। সভায় উপস্থিত

সকলেই সাথে সাথে প্রস্তাবটির স্বপক্ষে রাজী হয়ে হয়ে যান। এতে বিজ্ঞানের দিক থেকে কি লাভ হবে সেগুলি 'যুক্তিপূর্ণ' এবং 'গ্রহণযোগ্য' করে সাজানো হয়েছিল বহুকাল পরে। কয়েক কোটি ডলার শ্রাদ্ধ করে এবং বহু গোলমালের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালে এই দুঃসাহসী এবং চমকপ্রদ প্রকল্পটির মৃত্যু হয়। এই পরিচ্ছদটিতে পেমাষ্টার (Paymaster) এর বিপরীত দিক হিসেবে ধরা যেতে পারে—যেখানে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি হ'লেন বিজ্ঞানী স্বয়ং।

দুষিত পরিবেশ এবং বিজ্ঞানের হিংস্র, ধ্বংসাত্মক সামরিক প্রয়োগকে কেন্দ্র করে পশ্চিম দুনিয়ায় যে গণআন্দোলনগুলি ধুমায়িত হচ্ছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে 'বিজ্ঞান আক্রান্ত' (Science under attack) পরিচ্ছদটিতে। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার আজকে যে সমস্ত পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন (Environmental legislation) করতে বাধ্য হচ্ছে তার কারণ যে মানবতাবাদী সদিচ্ছা নয় বরং এই আন্দোলনগুলির প্রত্যক্ষ চাপ ঘটনাগতভাবে তা এখানে লেখক তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞানকে সামরিক স্বার্থে প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন যুদ্ধোপকরন উৎপাদনকারী কারখানার মালিক শ্রেণী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গত ষাটের দশকে যে সমস্ত শ্রমিক নাগরিক-ছাত্র এবং বিজ্ঞানীদের সফল আন্দোলনগুলি হয়েছে এই পরিচ্ছদে তার একটি বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৬৯-৭০ সালের এম, আই, টির ছাত্র আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, সামরিক এবং শিল্পপুঁজির গোপন লালসা ও স্বার্থের শেকড় কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পবিত্র' গবেষণাকেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করেছে, তার কিছু বাস্তব চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন।

আমাদের পর্য্যালোচনার শেষ পরিচ্ছদটি অর্থাৎ 'ভিতর থেকেই মতভেদ ও অশান্তি' (Dissent and disquiet from within) —বিজ্ঞানের নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রচলিত বিজ্ঞানের মানবতা বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে যে সংগঠিত বিদ্রোহগুলি গড়ে উঠছে তারই একটি বাস্তবানুগ চিত্রন। ব্যাপক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের সংকীর্ণ স্বার্থ, শ্রেণী নিপীড়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সেবায় তাকে নিয়োজিত করার বিরুদ্ধে যে সমাজ সচেতন বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে কলুষমুক্ত করার কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের বিভিন্ন সংগঠনগুলির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মধারা সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারনা এখানে দেবার চেষ্টা করেছেন ডিক্সন। সাথে সাথেই, যে বিশেষ-ঐতিহাসিক পটভূমিতে এই বিদ্রোহী সংগঠনগুলির জন্ম, ক্রমবিকাশ এবং আদর্শগত বিতর্ক সে সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকেরা পাবেন। এই সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সেসপা' (SESPA : Scientists and Engineers for social and Political Action), 'বিজ্ঞানীদের জনতথ্য প্রতিষ্ঠান' (Scientists Institute for Public Information) (যে সংগঠনটি ১৯৭১ সালে Fast Breeder Reactor এর পরিবেশ সংক্রান্ত ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জনসাধারনের সামনে প্রকাশ করার দাবীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পারমানবিক শক্তি কমিশনের (Us Atomic Energy Commission) বিরুদ্ধে মামলা করে জয়ী হয়), পরিবেশ রক্ষা সংস্থা (Environmental Defence Foundation) (এই সংগঠনটির চাপে DDT নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়) এবং বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্ব পালনে বৃটিশ সোসাইটি (British Society for Social Responsibility in Science)। এই সংগঠনগুলির মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারায় বহু পার্থক্য থাকলেও যে মূলপ্রশ্নটিতে তাঁরা একমত তা হ'ল, আজকের দুনিয়ার প্রতিটি বিজ্ঞানীর উচিৎ এই প্রশ্নটি নিজের সামনে তুলে ধরা : "কিভাবে আমার পেশাগত দক্ষতা ব্যবহার করবো যাতে তা সার্থকভাবে জনসাধারনের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে ?"

ভারতের সমাজ অর্থনীতি পশ্চিম দুনিয়ার মত নয়। বিজ্ঞান এখানে তার অনন্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে অবহেলিত। এদেশের কোটি কোটি অনশনক্লিষ্ট মানুষের স্বেদ ও অশ্রুর বিনিময়ে যে বিজ্ঞান কর্মীরা জীবন ও জীবিকার সংস্থান পেয়েছেন তাঁদের কাছেও আজকে এই আত্মজিজ্ঞাসা তীব্র হ'য়ে ওঠা দরকার।

আলোচিত বইটি তার অন্যান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আজকের দুনিয়ার পটভূমিতে বিজ্ঞানকর্মীকে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব ও ভূমিকা খুঁজে নিতে সাহায্য করবে।

দিলীপ হোতা

চিঠিপত্র

সম্পাদক, 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সমীপেষু,

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার মুখপত্র 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পড়ে ভাল লেগেছে। তবে কয়েকটা বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। প্রথমত, যেহেতু পত্রিকাটা সংস্থার সদস্য নন এমন পাঠকের কাছেও পৌঁছচ্ছে, সেহেতু এই সংস্থার উদ্দেশ্য, কিভাবে এটা কাজ করতে চায়, এইসব ব্যাপারে বিশদ আলোচনা প্রথম সংখ্যায় থাকা উচিৎ ছিল। এটা সংস্থার প্রতি বিজ্ঞানকর্মীদের আগ্রহী করে তুলতে ও এর কাজকর্মে তাঁদের অংশগ্রহণ করাতে সহায়তা করতো। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এগুলোর বিষয়ে বলা রয়েছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপে। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে সম্পাদকীয়র ভাষাটা একটু কঠিন হয়েছে, সম্পাদকদের আরও সহজ ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে, কারণ পত্রিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ এই ধরণের বুলেটিনকে আকর্ষনীয় করে তোলার মতো ছোট ছোট খবর প্রথম সংখ্যায় নেই বললেই চলে। ভবিষ্যতে এই ধরণের খবর ছাপানোর চেষ্টা হওয়া উচিৎ। এবশ্য এ ব্যাপারে পাঠকদের বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁদের উচিৎ ছোট ছোট খবর, তথ্য বা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য পাঠানো। তৃতীয়তঃ সুব্রত ভট্টাচার্য ও অভিজিত লাহিড়ীর লেখাটা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের দুরবস্থার কারণগুলো জোরালোভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। আমার মতে অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে এর একটা বড় কারণ হলো ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে গবেষকদের সচেতনতার অভাব। আমার মনে হয় এ অবস্থা পরিবর্তনে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বিশেষ ভুমিকা থাকতে পারে। যদিও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও মতামত এখন দিতে পারছি না, কয়েকটা কথা, মনে হচ্ছে, বলা যায়। এই সংস্থা (ক) বিজ্ঞানের সামাজিক তাৎপর্য আরোপের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচনা চক্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাতে পারে (খ) ভারতবর্ষের মতো দেশে বিজ্ঞানগবেষণার নির্দ্ধারক উপাদানগুলো কি হওয়া উচিৎ সে ব্যাপারে প্রচার পুস্তিকা বিলি করতে পারে (গ) স্কুল কলেজে ক্লাস নিয়ে বিজ্ঞানকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে ছাত্রদের অবহিত করতে পারে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ধন্যবাদান্তে

পার্থপ্রতিম মজুমদার

আই. এস. আই

কলিকাতা

সম্পাদক সমীপেষু 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী',

বিজ্ঞানকর্মীদের মতামত বিনিময়ের মাধ্যমরূপে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকার প্রকাশকে স্বাগত জানাচ্ছি।

ভারতীয় বিজ্ঞান নীতির মূল্যায়ণ সম্পর্কিত দীর্ঘ প্রবন্ধতে অনেক প্রসঙ্গ উথাপিত হয়েছে। প্রবন্ধ পড়ে মনে হল এরকম আলোচনা'ত অনেক হয়ে গেছে। ত্রুটি বিচ্যুতি বা গলদগুলোর মূলকারণ কি তাও অনেকবার শুনেছি। সমাধান কোথায়? বিজ্ঞাককর্মী হিসেবে আমরা কি করতে পারি বা আমাদের ভূমিকাই বা কি? বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে বিজ্ঞান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকৃত যোগাযোগ কতটা সম্ভব? এসব প্রশ্নের উত্তর প্রবন্ধে খুঁজে পাইনি।

আরেকটা ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিজ্ঞান-কর্মীদের পারস্পরিক যোগাযোগের বিশেষ কোন মাধ্যম না থাকায় বিজ্ঞানকর্মী সম্পর্কিত কয়েকটা সংখ্যাগত খবর আমাদের জানা থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞানসংস্থা কয়টি, তাতে মোট কতজন বিজ্ঞানকর্মী আছেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ এসব তথ্য যদি 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' মারফৎ জানা যায় তাহলে ভাল হয়। ইতি—

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
দেবজ্যোতি ভৌমিক
বিনায়ক দত্তরায়
কলিকাতা

[বিঃ দ্রঃ পত্রদাতারা যে ধরণের রচনা ও তথ্য আশা করেছেন ভবিষ্যতে এই পত্রিকার পাতায় তা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে। তবে এ ব্যাপারে পত্রিকার পাঠকদের দায়িত্বও যথেষ্ট। তাঁরা উপযুক্ত মতামত বা তথ্য পাঠালে পত্রিকার কার্যকারিতা বৃদ্ধি হবে। এছাড়া পত্র-দাতারা যে সংশয় বা প্রশ্ন ব্যক্ত করেছেন, পাঠকদের কাছ থেকে আরও কিছু চিঠিপত্র পাওয়া গেলে একত্রে সেগুলি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মতামত ও বক্তব্য রাখা হবে। অন্যান্য পরামর্শগুলিও বিবেচনা করা হচ্ছে। সম্পাদকমণ্ডলী]

মতামত

(দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থাগুলোতে বিজ্ঞানকর্মীদের কি ধরণের বিধিনিষেধ ও স্বৈরতন্ত্রের আওতায় থাকতে হয় অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৬।৩।৭৭ তারিখে ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ১২।৫।৭৭ তারিখে প্রকাশিত নিচের চিঠি দুটো থেকে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র নিয়ে জাতীয় জীবনে আন্দোলন অর্থহীন হয়ে থাকবে যদি না প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে থাকে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র। বিজ্ঞানকর্মীদের স্বাধীনতার বিষয়ে UNESCO থেকে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ আর WFSW থেকে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। বিজ্ঞানকর্মীদের কর্তব্য সেই নির্দেশ আর ঘোষণার সাথে এদেশের বাস্তব অবস্থা মিলিয়ে নেওয়া। আমরা চিঠি দুটো তুলে দিচ্ছি এই উদ্দেশ্য নিয়েই—কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন বা আক্রমণের উদ্দেশ্যে নয়। সম্পাদক মণ্ডলী)

মহাশয়—

বর্তমান নির্বাচন যে স্বৈরতন্ত্র আর গণতন্ত্র এই দুইয়ের যে কোন একটা বেছে নেওয়ার নির্বাচন, মিলিত বিরোধীগোষ্ঠীর ইস্তাহারে এই বিষয়ের ওপর যথাযথভাবেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁরা আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁরা সংবিধানের ৪২তম সংশোধন বাতিল ক'রে মৌলিক অধিকারগুলি ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে ৪২তম সংশোধন চালু হওয়ার আগে থেকেই ভারতীয় যাদুঘর, বোস ইনষ্টিটিউট, সাহা ইনষ্টিটিউট, এশিয়াটিক সোসাইটি, সি. এস. আই. আর গবেষণাগারসমূহ ও এই জাতীয় আরও অনেক সংস্থার কর্মীদের পেশাগত বিরোধ বা কর্তৃপক্ষের ভিত্তিহীন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার কোন অধিকার ছিল না। এঁদের চাকুরী নির্দ্ধারিত হয় সামন্তযুগীয় 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্কের সূত্রের ওপর ভিত্তি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকুরীর সর্তগুলো হলো একতরফা, অযৌক্তিক, আর আদালতের পরিধির বাইরে।

আমি এই ধরণের দুঃখজনক পরিস্থিতির প্রতি মিলিত বিরোধীগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি তাঁদেরকে আরও অনুরোধ করবো যে তাঁরা যদি ক্ষমতায় আসেন তবে তাঁরা এই 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক বাতিল করে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ফিরিয়ে দেবেন আর গণতন্ত্রের ভিতর গণতন্ত্র বলবৎ করবেন, এই মর্মে যেন তাঁরা উপরোক্ত হাজার হাজার কর্মীকে আশ্বাস দেন।

(অমৃত বাজার পত্রিকা ১৬।৩।৭৭)

সৌরীন বসু
কলিকাতা

জরুরী অবস্থায় সরকারী জবরদস্তি ও অবিচার কীভাবে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিভাগের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছিলো তার অন্যতম দৃষ্টান্ত এনথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া। যে ২।১টি কেন্দ্রীয় সংস্থার হেড অফিস এখনো কলকাতায় টিমটিম করছে এটি তারই অন্যতম। এর প্রাক্তন ডিরেক্টর বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে নিযুক্ত হওয়ার পর সরকার এমন একজন ডিরেক্টরকে পাঠালেন যিনি বিজ্ঞানী বা গবেষক না হলেও সেই ম্যাজিক-লণ্ঠনের অধিকারী যার নাম আই, এ, এস; যদিচ ঐ সংস্থার বহু বিজ্ঞানী (এনথ্রোপলজিস্ট) ডেপুটি ডিরেক্টর সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘকাল কাজ করছেন। এদের মধ্যে অনেকেই কেবল যে ভারতের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত নৃবিজ্ঞানী তাই নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতিসম্পন্ন। যেহেতু এঁরা নতুন ডিরেক্টর মহোদয়ের খেয়াল খুশির চামচে হতে চাননা এরা প্রত্যেকেই হেড অফিস কলকাতা থেকে বিতাড়িত হলেন। ডেপুটি ডিরেক্টরের মর্যাদাসম্পন্ন কোনো কোনো অফিসার ছমাসের মধ্যে একাধিকবার বদলির আদেশ পেয়েছেন। এর ফলে কেবল যে সরকারের বিপুল অর্থ অহেতুক অপব্যয়িত হয়েছে তাই নয় সংস্থায় মূল কাজ ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ গবেষণা ও সমাজের অবহেলিত ও দুর্বল শ্রেণীর উন্নয়ন প্রকল্প—সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। গবেষণা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে নগ্ন চক্রান্ত, প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্রের মল্লভূমি। এছাড়া ডিরেক্টর মহোদয়ের খেয়ালবশত নির্বাচিত রিসার্চ ফেলোরা নিযুক্তি পেলেন না। ২।১ জন নিযুক্তর পর বরখাস্ত ও হলেন। এরা সকলই বাঙালী ছিলেন। সুতরাং বেশ কিছু তরুণ বাঙালী বিজ্ঞান-গবেষক সাময়িক চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। এবং তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ নয় বলেই ইউ পি এস সি কর্তৃক মনোনীত একজন বাঙালী বিজ্ঞানী অফিসারকে জয়েন্ট ডিরেক্টর পদে নিযুক্তি দেননি।

এই সার্ভের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করায় প্রাক্তন ডিরেক্টর, পশ্চিমবাংলার একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও একজন প্রাক্তন এম-পি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রবল 'সুফলা ইমার্জেন্সী' তাঁদের সকল, উদ্বেগ ও প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ চন্দ্রের কাছে বিনীত আবেদন তিনি যেন উপরোক্ত বিষয় অবিলম্বে এক সার্বিক তদন্তের ব্যবস্থা করেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা
১২/৫/৭৭)

—অপরূপ সেন
কলকাতা-৪৭

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক হিরন্ময় সাহা কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

হবে যদি তাঁর বিজ্ঞানের কোন একটি শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অথবা সমতুল ডিপ্লোমা থাকে।

কেতাবী শিক্ষার সার্টিফিকেটের অভাব আছে এমন কোন ব্যক্তি—যাঁর ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রাথমিক শর্ত পূরণ হচ্ছে না—তিনিও বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে পরিগণিত হবেন যদি তাঁর নিম্নোক্ত যোগ্যতাবলী থাকে (অবশ্যই দেখানে দেখতে হবে যে সাধারণ মানের যেন কোন অবনয়ন না ঘটে):—

(১) উচ্চ বৈজ্ঞানিক দক্ষতা প্রয়োজন এমন কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠান, তৎসহ মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

(২) বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাবলী রচনা ও প্রকাশনা।

(৩) স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সাফল্য।

বিজ্ঞানকর্মীদের পেশাগত মান নির্ধারণের ব্যাপারে যাতে একটি আন্তর্জাতিক মতৈক্যে পৌছানো যায় তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

২.৩. নিয়োগের স্থান :

বিজ্ঞানকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, শিল্পে এবং সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত হতে পারেন। তাঁরা লেখক, পরামর্শদাতা, ইত্যাদি হিসাবে স্বাধীন পেশায়ও নিযুক্ত থাকতে পারেন।

২.৪. তালিকাভুক্তির ক্ষেত্র :

জাতি, জাতীয়তা, ধর্মমত, সামাজিক মর্যাদা এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের বৈজ্ঞানিক পেশা গ্রহণের সমান সুযোগ পাওয়া উচিত।

২.৫. বিজ্ঞানের অগ্রগতি :

সরকারগুলির উচিত বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাহায্য করা এবং আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা এবং গবেষণার কাজে যথাযোগ্য শিক্ষিত বিজ্ঞানকর্মীর নিয়োগে উৎসাহ দেওয়া।

যেহেতু, আমাদের যুগের সমস্যাগুলিতে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির সঠিক প্রয়োগের সঙ্গে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োগপদ্ধতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ বিজ্ঞান কর্মীদের থাকা উচিত।

বৈজ্ঞানিক সততার থেকে বিরত হওয়ার জন্য বিজ্ঞান-কর্মীদের উপর যে সব চাপ সৃষ্টি করা হয় তাকে প্রতিরোধ করতে বিজ্ঞান-কর্মীদের সরকারী সমর্থন পাওয়া উচিত।

৩. বিজ্ঞানকর্মীদের মৌলিক অধিকার

৩.১ নাগরিক অধিকার :

জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক স্বীকৃত 'মানবাধিকার চুক্তি' এবং 'মানবাধিকার সম্পর্কিত সাধারণ ঘোষণা' যেসব নাগরিক অধিকার নির্দিষ্ট করেছে তার প্রত্যেকটিই বিজ্ঞান কর্মীদের ক্ষেত্রে জাতি, জাতীয়তা, ধর্মমত, স্ত্রী-পুরুষ এবং রাজনৈতিক প্রত্যয় নির্বিশেষে বহাল থাকবে।

৩.২ কর্মপ্রাপ্তির অধিকার :

নিজ নিজ বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পাওয়ার অধিকার বিজ্ঞান কর্মীদের থাকা উচিত এবং এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে সরকারের যত্নশীল হওয়া উচিত।

৩.৩ অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অধিকার :

বিজ্ঞানকে যদি সক্রিয়ভাবে মানবজাতির কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে হয় তাহলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞানকর্মীদের বৈজ্ঞানিক কাজ এবং তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের ওপর মতামত ও অভিজ্ঞতার অবাধ বিনিময়ের সুযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক মতামত প্রকাশের এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে সরকারগুলির বিরত থাকা উচিত এবং অন্য কোন সূত্র থেকে যদি এই স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হয় তাহলে তা বন্ধ করার জন্য সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

৩.৪ পরিচালন সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধিত্বের অধিকার :

বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উন্নয়নের মান ও পরিচালনের উন্নতিসাধনের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাতে বিজ্ঞানকর্মীদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষের স্বীকার করে নেওয়া উচিত। বিজ্ঞান এবং তার গবেষণা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিচালক-মণ্ডলীগুলিতে বৈজ্ঞানিকদের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।

কর্তৃপক্ষের এ বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত যেন উপযুক্ত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাসম্পন্ন বিজ্ঞানকর্মীদের হাতে বৈজ্ঞানিক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়।

৩.৫ পক্ষপাতহীনতা :

জাতি, জাতীয়তা, ধর্মমত, রাজনৈতিক প্রত্যয় এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বিজ্ঞানকর্মীদের নিজ নিজ পেশায় সমান অধিকার থাকা উচিত।

৩.৬ স্বাধিকার রক্ষা :

নিজেদের অধিকারগুলিকে রক্ষা করার অধিকার বিজ্ঞানকর্মীদের থাকা উচিত।

৪. নিজেদের কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানকর্মীদের অধিকার

৪.১ চাকুরির চুক্তি :

নিয়োগকারী সংস্থাগুলির এবং প্রত্যেক বিজ্ঞানকর্মীর অধিকার, কর্তব্য এবং দায়িত্বসমূহ হয় আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে অথবা নিয়োগকারী সংস্থা এবং বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে পরিস্কারভাবে বর্ণিত হওয়া উচিত। এই আইন অথবা চুক্তির মধ্যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় (যেমন, যদি বিজ্ঞানকর্মীকে একই অবস্থায় অন্য কোন বৈজ্ঞানিক কাজে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয়) প্রযোজ্য নিয়মগুলিরও পরিস্কার উল্লেখ থাকা উচিত।

৪.২ চাকুরীর ধরন :

বিজ্ঞানকর্মীদের যোগ্যতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ বিজ্ঞান-কর্মীকে দেওয়া এবং চুক্তিতে উল্লিখিত কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে পালনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারটি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪.৩ কর্মস্থলে প্রয়োজনাতিরিক্ততা :

পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে, যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্টমানের বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা বাড়তি অথবা অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে মনে হচ্ছে, তাহলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছাঁটাই এড়ানো অথবা ন্যূনতম করার জন্য পরামর্শ হওয়া উচিত। এ সত্ত্বেও যদি প্রয়োজনাতিরিক্ততা বজায় থাকে, তবে প্রত্যেকটি বিজ্ঞানকর্মীকে যথোপযুক্ত সাহায্য এবং পূর্ণবেতনসহ সময় দেওয়া উচিত যাতে তিনি অন্য উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হতে পারেন, অথবা তাঁর পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।

৪.৪ চাকুরি থেকে ছাঁটাই :

কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে একজন বিজ্ঞানকর্মীকে ছাঁটাই করা যেতে পারে সেটা আইন দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৪.৫ চাকুরী পরিবর্তনের সময় প্রশংসাপত্র প্রদান :

কোনো একটি চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় প্রত্যেক বিজ্ঞান-কর্মীর একটি প্রশংসাপত্র পাওয়া উচিত যাতে চাকুরীকালের তাঁর ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কিত প্রধান প্রধান তথ্যগুলির উল্লেখ থাকবে; প্রশংসাপত্রটি দেওয়ার আগে তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞানকর্মীর সাথে আলোচনা করতে প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে এবং এই প্রশংসাপত্রে এমন কিছু থাকবেনা যা বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

৪.৬ ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের পরিবেশ :

যেহেতু বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানশিক্ষকদের কাজ অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য এগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করা উচিত যাতে বিজ্ঞানকর্মীদের সময় এবং শক্তির অযথা অপচয় না হয় এবং তাঁদের কাজের জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানকর্মীদের মোট কাজের সময় কখনই যেন অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশী না হয়। সৃজনধর্মী কাজের ক্ষেত্রে নমনীয়তার প্রয়োজন স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং এমন কোন কঠোর সময় নির্ঘন্ট অনুসরণের প্রয়োজন নেই—যা সামগ্রিকভাবে কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে (প্রয়োগবিদ এবং অন্যান্য কর্মীদের আনুষঙ্গিক কাজের পরিমাণ হিসাবের মধ্যে এনে)।

বিজ্ঞানকর্মীদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য তাঁদের ছুটি এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেওয়া উচিত যাতে তাঁরা স্নাতোকত্তর পাঠক্রমগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

বিজ্ঞানকর্মীদের যথোপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া উচিত যাতে তাঁরা তাঁদের কাজের সময়ের একাংশ তাঁদের পেশায় নিযুক্ত অন্যান্য সহ-কর্মীদের সাথে সম্মেলনের মাধ্যমে অথবা অন্যভাবে যোগাযোগের জন্য ব্যয় করতে পারেন।

মুদ্রিত রচনাদির মাধ্যমে আধুনিকতম তথ্যাদি আহরন করে যাতে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও যোগ্যতার গভীরতা এবং পরিধি বৃদ্ধি করতে পারেন তার সুযোগ বিজ্ঞানকর্মীদের দেওয়া উচিত।

৪.৭. বেতন নির্ধারণ :—

বিজ্ঞানকর্মীদের বেতন নিয়োগকারী সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া উচিত। বিজ্ঞান কর্মীদের বেতনহার নির্ধারণের সময় তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক কাজের অভিজ্ঞতার পরিমান ইত্যাদি বিবেচিত হবে কিন্তু তা জাতি, জাতীয়তা, ধর্মবিশ্বাস অথবা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কখনই বিবেচ্য হবে না।

৪.৮. সরকারী ছুটি

সাধারণ সরকারী ছুটির দিনগুলি ছাড়াও সমস্ত বিজ্ঞানকর্মীর বৎসরে একবার সবেতন ছুটীর অধিকার ভোগ করা উচিত এবং তা যেন অন্যূন একমাসের হয়।

৪.৯ বিভিন্ন ধরনের অবকাশ :

কয়েকবছর চাকুরীর পর একজন বিজ্ঞানকর্মীকে বিজ্ঞান তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র অথবা বিজ্ঞানের ঐ শাখার সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে পড়া-শুনোর জন্য সবেতন যথেষ্ট সময়ের অবকাশ দেওয়া উচিত। পড়াশুনার জন্য এই অবকাশকে বিজ্ঞানকর্মীর চাকুরীতে অগ্রাধিকার এবং অবসর-কালীন বেতনের ক্ষেত্রে কাজের সময় হিসাবেই ধরা হবে এবং ৪.৬

অনুচ্ছেদে বর্ণিত আধুনিকতম তথ্য আহরণের জন্য প্রদেয় সুবিধাগুলির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হবে। উন্নতিকামী এবং উন্নত দেশের সংস্থাগুলির স্থিরীকৃত বিধির ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তির অংশ হিসাবে চাকুরীতে অগ্রাধিকার ও অবসরকালীন সুযোগসুবিধাগুলির ক্ষতি না করে বিজ্ঞানকর্মীদের ছুটি দেওয়া উচিত। উপরন্তু, তাঁদের অতিরিক্ত ব্যয় মেটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়ন অথবা পেশাগত সংগঠনগুলির কার্য্যকলাপে যোগদানের জন্য বিজ্ঞানকর্মীদের পূর্ণবেতনসহ ছুটি পাওয়া উচিত। চাকুরীতে নিয়োগের পূর্বেই স্থিরীকৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী বিজ্ঞানকর্মীদের উপযুক্ত ব্যক্তিগত কারণে পূর্ণবেতনসহ ছুটী পাওয়া উচিত।

৪.১০ বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ব্যবস্থা :

বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত অথবা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কর্মরত বিজ্ঞানকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন সরকারের আইন প্রণয়ন করা উচিত। এই সব বিজ্ঞানকর্মীর জন্য কাজের সময় কমানোর, দীর্ঘতর ছুটি এবং বিশেষ বিপদভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এইসব বৃত্তিগুলি থেকে উদ্ভূত রোগ এবং দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকর্মীদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা উচিত।

৪.১১ প্রসবকালীন ছুটী :

জাতীয় আইন অনুসারে প্রসবকালীন যত্ন এবং সাহায্য ছাড়াও মহিলা বিজ্ঞানকর্মীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত—যেমন, প্রসবের আগে এবং পরে ছুটি, ছুটির পর তাঁদের নিজেদের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়া অথবা প্রসবকালীন ছুটির আগে যে পদে তিনি কাজ করতেন সেই একই পদে অন্য চাকুরীতে বহাল হওয়া উচিত।

৪.১২ অসুস্থতা জনিত ছুটি এবং অবসরকালীন ভাতা :

অসুস্থতা অথবা সাময়িক অক্ষমতার জন্য একজন বিজ্ঞানকর্মী যতদিন কাজে যোগদান করতে অসমর্থ হবেন ততদিনই তাঁর পূর্ণবেতনসহ ছুটি পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। বার্ধক্য অথবা স্থায়ী অক্ষমতার জন্য অবসরকালীন ভাতা বিজ্ঞানকর্মীর চাকুরী থেকে উপার্জিত আয়ের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত হওয়া উচিত যাতে তিনি জীবনধারণের উপযুক্ত মান বজায় রাখতে পারেন। যেসব ক্ষেত্রে সরকারের সাধারণ সামাজিক নিরাপত্তা বিধি অনুসারে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বর্তমান ঘোষণায় উল্লিখিত সুবিধার চেয়ে কম হবে সেইসব ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা এবং উপযুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে স্থিরীকৃত পরিপূরক পরিকল্পনা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সুপারিশকৃত স্তরে উন্নীত করা উচিত। যখন একজন বিজ্ঞানকর্মী নিজের দেশে অথবা অন্য দেশে চাকুরী পরিবর্তন করবেন তখন সাথে সাথে তাঁর সমস্ত অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারও স্থানান্তরিত করা সম্ভব হওয়া উচিত।

৫. বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার

৫.১ সংগঠিত হওয়ার অধিকার :

নিজেদের পদমর্য্যাদা এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে রক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার অধিকার, এই সব ট্রেড ইউনিয়নে সভ্য হওয়ার অধিকার এবং অন্যদের এইসব ট্রেড ইউনিয়নে সভ্য হিসাবে নিয়োগ করার অধিকার থাকা উচিত, যা কিনা আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার ৯৮ নং ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। এইসব সংগঠনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য সভ্যদের কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়া উচিত নয়।

৫.২ ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বাধীনতা :

বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাষ্ট্র অথবা নিয়োগকর্তার অধীন হবে না এবং এগুলি সরকারী এবং নিয়োগকারীর হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া উচিত।

৫.৩ সভ্যদের অধিকার এবং স্বার্থরক্ষা :

নিজ নিজ দেশে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির আত্মরক্ষা এবং বিজ্ঞানকর্মীদের স্বার্থরক্ষার জন্য আইনসঙ্গত অধিকার থাকা উচিত।

৫.৪ অবাধ মেলামেশার অধিকার :

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অন্যান্য সংগঠনগুলির সাথে অবাধ মেলামেশার অধিকার বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির থাকা উচিত।

৫.৫ আইনগত অবস্থান :

বিজ্ঞানকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির মীমাংসাকারী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং সদস্য বিজ্ঞানকর্মীদের স্বপক্ষে কাজকরার আইন-সঙ্গত অধিকার এগুলির থাকা উচিত। বিজ্ঞানকর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করার এবং তাঁদের স্বার্থরক্ষা করার আইনসঙ্গত অধিকারও ট্রেড ইউনিয়নগুলির থাকা উচিত।

অনুবাদক : **মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিজ্ঞানীর স্বাধীনতা

বিজ্ঞানীর স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন, এই স্বাধীনতা খর্ব হলে, বিজ্ঞান ব্যক্তিগত স্বৈরাচার আর সংকীর্ণ স্বার্থের অধীন হলে, সমাজের অগ্রগতি কতটা ব্যহত হতে পারে, এ নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে—পৃথিবীর মানুষ অভিজ্ঞতার মূল্যে শিখেছে বিজ্ঞানীর স্বাধীনতার গুরুত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞানীদের মেনে চলতে হয় অপমানজনক বশ্যতা। এ নিয়ে বিলাপ সম্পূর্ণ অর্থহীন। প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের স্বাধীনতা হরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, এগুলির বিপরীতে আমরা কি চাই তা পরিস্কারভাবে স্থির করা, এবং তা কার্যকর করার জন্য জনমত গঠনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগোনো। বিজ্ঞানকর্মীদের ওপর সবরকম অবিচার আর অন্যায়ের নিরসন একই সাথে আশা করলে স্পষ্টতঃই তা হবে কল্পনাবিলাস। যে কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে যে দাবীগুলো বাস্তবায়িত করা সম্ভব সেগুলো ধৈর্যসহকারে কার্যকর করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পরবর্তী ধাপের সাংগঠনিক ভিত্তি স্থাপন সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক গবেষণাগারের বিজ্ঞানকর্মীদের গবেষণাগারের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অর্থাৎ পেশার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদের ক্ষেত্রে, আদালতের সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকার নেই। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারায় উল্লিখিত কোন অধিকার নেই। আইনী পরিভাষায়--এবং অনেকক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থেও বটে—প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে এঁদের 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক বিদ্যমান। বাস্তবে এই 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্কের ফলশ্রুতি কি তার একটা উদাহরণ হিসাবে কলকাতার এক নামকরা গবেগণাপ্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক জরুরী অবস্থায় ছাঁটাই হওয়া এক কর্মীর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। ঐ প্রতিষ্ঠানেরই একজন ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে তদন্তকারী নিযুক্ত ক'রে এবং ঐ কর্মীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে, তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। পরে সেখানকার কর্মীরা আইনী পরামর্শ নিতে গিয়ে শুনলেন যে এ ব্যাপারে আদালতের কাছ থেকে কোনও সুরাহা তাঁরা আশা করতে পারেন না—কারণ এই প্রতিষ্ঠান ওপরের ঐ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের আওতায় পড়ে।

এ সংখ্যায় আমরা বিজ্ঞানকর্মীদের বিশ্ব সংস্থার যে অধিকার সনদ আর UNESCO-র যে দলিল প্রকাশ করছি ওপরে বর্নিত অবস্থাটি স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণভাবে তার বিরোধী সারা দেশে সমস্ত বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানে যাতে এই পরিস্থিতির নিরসন ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানকর্মীদের জনমত গঠন ও সংগঠিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকর্মীদের যে কোন কর্মসূচীতেই এটা একটা প্রথম ধাপ হওয়া আবশ্যক। এ কাজ বিজ্ঞানকর্মীদের সাধ্যের বাইরে নয়, এবং এ কাজে তাঁরা WFSW আর UNESCO'র মতো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সমর্থনও আদায় করতে পারেন। যদিও এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের অবিচার আর জুলুমের মূলগত নিরসন আশা করা যায় না, তবু এর মাধ্যমে তাঁরা পেতে পারবেন ন্যূনতম আইনী সুযোগ সুবিধা আর অগ্রসর হতে পারবেন আরও কার্যকর কর্মসূচীর দিকে।

আমরা এ প্রসঙ্গে সকল বিজ্ঞানকর্মীর ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি তথা সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সম্পাদকমণ্ডলী